১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬ থেকে নজিরহীন মাত্রায় দাঙ্গার ফলে গোটা ভারতের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ১৬ থেকে ১৯ অগাস্ট কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা। তারপর ১ সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাই ছুঁয়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি (১০অক্টোবর), বিহার (২৫ অক্টোবর), যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে (নভেম্বর) এবং মার্চ ১৯৪৭ থেকে পাঞ্জাবকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের উস্কানি ছিল সর্বত্র দাঙ্গার উপাদান। দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ দায়িত্বের প্রশ্নে, বিস্তারে ও আকারে, আগের থেকে এইসব দাঙ্গার চরিত্র ছিল লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে লীগ মন্ত্রিসভা কলকাতায় ছুটি ঘোষণা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী সুহ্‌রাবর্দি সেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন, ময়দানের সেই জমায়েতের পরই ব্যাপক মুসলিম আক্রমণ শুরু হয়। সুহ্‌রাবর্দি প্রায়শই তাঁর কিছু সমর্থক-পরিবেষ্টিত হয়ে দীর্ঘ সময় লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে কাটান আর 'নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের দুর্দশার জন্য হতাশ্বাসকর ব্যতিব্যস্ততা দেখান' (ওয়াভেলকে লাট বারোজ, ২২ অগাস্ট, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৯৭-৩০০)। হিন্দু ও বিশেষত শিখ গুণ্ডারা জোরদার পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে 'কলকাতার নিচের মহলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যের মধ্যে তা এক গণহত্যালীলা'য় পরিণত হয়। পরিণামে ১৯ অগাস্ট ৪০০০ নিহত ও ১০,০০০ আহত হন। রাস্তায় পড়ে-থাকা বহু সংখ্যক গলিত শব সরানোটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় (*ঐ*, পৃ. ৩০২)। আগেকার দাঙ্গার মতো মন্দির বা মসজিদ অপবিত্র করা, ধর্ষণ বা অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পত্তির ওপর চড়াও হওয়া নয়, কলকাতা-দাঙ্গার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল—খুন, মনে হয়, হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই এতে নিহত হয়েছিলেন বেশি, শুধু ওয়াভেলই নয় (*ঐ*, পৃ. ২৭৪), প্যাটেলও এই মত পোষণ করেছিলেন ('কলকাতায় হিন্দুরাই জিতেছে। কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়', ক্রিপসকে লেখা চিঠি, ১৯ অক্টোবর, *ঐ*, পৃ. ৭৫০)। ব্রিটিশদের দায়িত্বও ছিল সমান স্পষ্ট ঃ নভেম্বর ১৯৪৫ অথবা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর একেবারে বিপরীতে, ২৪ ঘণ্টা পেরনোর আগে সেনাবাহিনী রাস্তায় নামেনি, যদিও ১৭ অগাস্ট ভোরে সফর করার সময়ে লাটসাহেবের মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা। ২৬ মার্চ ও ১ এপ্রিল ১৯৪৭-এর মধ্যে কলকাতায় দ্বিতীয় দফা দাঙ্গা বাধে। স্বাধীনতার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই হাঙ্গামা ও ছুরি মারার ঘটনা চলতেই থাকে, শহরের বড় বড় এলাকায় কয়েক মাস যাবৎ এক অথবা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বোম্বাই শহরে শুরু থেকেই ধাঁচটা ছিল বড় আকারে দাঙ্গা নয়, ইতস্তত ছুরি মারার ঘটনা, যদিও তা হয়েছিল ব্যাপকভাবে ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ ১৬২ জন হিন্দু ও ১৫৮ জন মুসলমান এতে নিহত হন (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ৫৩২, ৬৪৮)। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা—পূর্ববঙ্গের এই দুটি জেলায় কৃষিজীবনে অস্থিরতার একটা ঐতিহ্য ছিল। সেখানে কৃষকরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান আর হিন্দুরা ছিলেন মূলত ভূস্বামী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠী। তাই

Scanned with CamScanner

দাঙ্গার মধ্যে বিকৃত সামাজিক উপাদানও চোখে পড়ে। অক্টোবরের হাঙ্গামায় উত্তর-পশ্চিম কোণে খুনোখুনির চেয়ে সম্পত্তির ওপর চড়াও হওয়া আর ধর্ষণের ঘটনাই ছিল প্রধান। এটা ছিল কলকাতা দাঙ্গার ঠিক উল্টো। নিহতের সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ৩০০ ; কিন্তু সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কোটি কোটি টাকার। জমিদার, আইনজীবী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর আক্রমণের কথাই হিন্দুতরফের গোড়ার অভিযোগগুলোয় বড় করে এসেছিল। বারোজ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী 'দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার অস্থিরতা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোনো সাধারণ অভ্যুত্থান নয়, বরং এটি একদল গুণ্ডার (স্পষ্টতই সংগঠিত) কাজ। সে সাম্প্রদায়িক অনুভূতি বহাল ছিল সেটাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।' নিহতের সংখ্যা ছিল তুলনায় 'কম' কিন্তু 'সম্ভবত সম্পত্তি নাশের পরিমাণ প্রচুর বলে দেখা যাবে'। লীগ প্রশাসন আবারও জোর করে নির্লজ্জ পক্ষপাত দেখাল। গ্রেপ্তার হয়েছিল ১০৭৪ জন, তার মধ্যে এপ্রিল ১৯৪৭ অবধি ৫০ জন মাত্র জেলে বন্দী ছিল। (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ৭২৫, ৭৪৫, ৭৫৩ ; নির্মলকুমার বসু, *মাই ভেজ উইথ গান্ধী*, পৃ. ৩৩, ৪৮, ৩০২)

২৫ অক্টোবর 'নোয়াখালি দিবস' উদ্‌যাপনের পরপরই বিহারের দাঙ্গায় অন্য এক ধাঁচ দেখা দিল যা ব্যাখ্যা করা আরও কঠিন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু কৃষকদের গণ-অভ্যুত্থান। ফল হলো নোয়াখালি দাঙ্গার চেয়ে সত্যিই আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এক হত্যাকাণ্ড, নিহতের সংখ্যা অন্তত ৭০০০। আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি নেহরু জানালেন, যে-জায়গাটি ছিল কংগ্রেসের (সেই সঙ্গে কিসান সভারও) পুরনো ঘাঁটি, সেখানে 'জনগণকে গ্রাস করেছে এক উন্মত্ততা'। তিনি সন্দেহ করেন, এর পেছনে কিছু ভূস্বামীরও প্ররোচনা ছিল, 'কৃষি সমস্যা থেকে তাদের প্রজাদের মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে'। আর তিনি লক্ষ্য করেন যে, কংগ্রেস-চালিত প্রশাসন ও দলের অনেক সদস্যও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন। 'সত্যিকারের যে ছবি এখন দেখতে পাচ্ছি তা বেশ খারাপ ; এমনকি ওরাও (লীগ নেতৃত্ব) যা আভাস দিয়েছে তার চেয়েও খারাপ' (প্যাটেলকে নেহরু, ৫ নভেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, খণ্ড ৩, পৃ. ১৬৫)। বিহারের পরের ঘটনা যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বর। যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা এক হাজার মুসলমানকে খতম করে। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের খবর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এ-তাবৎ অটল অবস্থাকে দ্রুত দুর্বল করে দেয়। অক্টোবর ১৯৪৬-এর শেষদিকে ঐ প্রদেশ সফরের সময় নেহরুকে বেশ কিছু বৈরী জনগোষ্ঠীয় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। জানুয়ারি ১৯৪৭-এ হাজারায় দাঙ্গার পরে মারদানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়।

ইতোমধ্যে মুসলমান, হিন্দু ও শিখরা একইভাবে তৈরি হচ্ছিল তার জন্যে যেটি সবচেয়ে বড় মহামারণ বলে প্রমাণিত—সেটি ঘটল পাঞ্জাবে। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে হরিয়ানার হিন্দু জাঠ নেতা ছোট্টুরামের মৃত্যুতে ইউনিয়নিস্ট ব্লক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বলদেও সিং-এর কলকাঠি নাড়ায় কংগ্রেস ও শিখ সমর্থনের মধ্যে দিয়ে খিজার হায়াত খানের মন্ত্রিসভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমনকি নির্বাচনেও লীগ যেখানে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা আর পাকিস্তানপন্থী মনোভাবকে উস্কানি দিয়ে ৭৯টি আসন লাভ করে, ইউনিয়নিস্টরা সেখানে মাত্র ১০টি আসন পায়। জানুয়ারি ১৯৪৭ থেকে লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের দরুন ৩ মার্চ খিজার মন্ত্রিসভার

Scanned with CamScanner

পতন ঘটে। পরদিন লাহোরের আইনসভা কক্ষের সামনে প্ররোচনামূলক শিখ বিক্ষোভ (তলোয়ার ঘুরিয়ে তারা সিং জিগির তোলেন ঃ 'রাজ করেগা খালসা', খালসা রাজত্ব করবে) দেখানোর পরই লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, আট্টোক ও রাওয়ালপিণ্ডিতে, আর সেইসঙ্গে শেষ তিনটি জেলার গ্রামাঞ্চলেও বড় মাপের দাঙ্গা বাঁধে। মুসলমানপ্রধান এই অঞ্চলগুলিতে দাঙ্গার মুখ্য লক্ষ্যই ছিল শিখ ও হিন্দু ব্যবসায়ী আর মহাজনরা। অগাস্ট ১৯৪৭-এ প্রায় ৫০০০ মানুষ নিহত হন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সীমান্তের দু'ধারের নিধন-যুদ্ধের তুলনায় এও নিতান্তই উপক্রমণিকা বলে প্রমাণ হয়। শরণার্থীদের ট্রেনগুলি তখন মাঝে মাঝে শুধু মৃতদেহই আনত। পেন্ডেরেল মুন-এর হিসাব মতো নিহত হয়েছিলেন আনুমানিক ১৮০,০০০, তার মধ্যে ৬০,০০০ ছিলেন পশ্চিমের আর পূর্বের ১২০,০০০। মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে শরণার্থীতে পরিণত হন ৬০ লক্ষ মুসলমান এবং ৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ। তার ফলে কার্যত সম্পূর্ণ ও বাধ্যতামূলক জনবিনিময় ঘটে গেল, পূর্ব পাঞ্জাবে পড়ে রইল ৪৭০,০০০ ও পশ্চিমে ৬৭০,০০০ একর জমি। সামগ্রিকভাবে 'মুসলমানরাই প্রাণ হারিয়েছিলেন বেশি আর হিন্দু ও শিখরা হারিয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি'। ১৯৪৭-এ মুন যেখানে কাজ করছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবের সেই বাহাওয়ালপুরে 'সাধারণ মুসলিমরা (মূলত কৃষক) রক্তের চেয়ে হিন্দু সম্পত্তি ও হিন্দু তরুণী উপভোগেই বেশি উৎসাহী ছিল'। মধ্য ও পূর্ব-পাঞ্জাবে বিরোধী সম্প্রদায়গুলি অনেক বেশি সমবলী ছিলেন। বিশেষত শিখরা মুসলমানদের সরিয়ে দেওয়া বা তাড়িয়ে দেওয়ায় এক নির্দয় সংকল্পের পরিচয় দেন, যাতে পশ্চিম থেকে চলে-আসা কুড়ি লক্ষ শিখের জন্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। (পেন্ডেরেল মুন, *ডিভাইড অ্যান্ড কুইট*, অধ্যায় ১৪)।

অনেক দেরিতে, জুন ১৯৪৬-এর শেষাশেষি যে ব্রিটিশরা কংগ্রেসের সম্ভাব্য আন্দোলনের সূত্রে পাঁচ বাহিনী সেনা ভারতে আনার পরিকল্পনা করেছিল (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ১৩-১৫) মানুষের এহেন ভয়াবহ করুণ পরিণতির দায় যখন তাদের ওপর বর্তায় তখন তারা এ ব্যাপারে তেমন কিছুই করেনি। দুটি দৃষ্টান্ত—দুটিই ব্রিটিশ সূত্র থেকে নেওয়া—সরকারি নিষ্ক্রিয়তার—যদি না ইচ্ছাকৃত যোগসাজসের হয়—মাত্রা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। দাঙ্গা থামাতে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের জন্য বিহারের মুসলমানরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ৯ নভেম্বর ১৯৪৬-এ ওয়াভেল মন্তব্য করেন ঃ 'বাধ্য না-হলে কেউ আকাশ থেকে মেশিনগানের মতো অস্ত্র চালায় না, যদিও খানিকটা লজ্জার ব্যাপার এই যে, মুসলমানরা বলছেন, ১৯৪২-এ এর ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করিনি' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৩৭৪)। মার্চ ১৯৪৭-এ অমৃতসরের দুটি প্রধান বাজার ধ্বংস হয়ে যায়, 'পুলিশ (সেখানে) একটি গুলিও ছোঁড়ে নি'—এবং পেন্ডেরেল মুন সঠিকভাবেই স্মরণ করেছেন, এটিই ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শহর (মুন, পৃ. ৭৮, ৮০-১)।

নেহরুর অন্তর্বর্তী সরকার এই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক নারকীয়তার সামাল দিতে অসহায় হয়ে পড়েছিল। 'অন্তর্বর্তী সরকার' এই নাম সত্ত্বেও এটি প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের জের টানার বেশি কিছু ছিল না। ১৯ মার্চ ১৯৪৭-এ ওয়াভেল তাঁর মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীদের মত বাতিল করে দেন। ২৬ অক্টোবর তিনি যখন জিন্নাকে বোঝালেন যে, লীগের তফসিলী মনোনীত সদস্য (যোগেন মণ্ডল)

Scanned with CamScanner

কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যের পাল্লা সমান করবে, এই ভিত্তিতে তাঁর সরকারে যোগ দেওয়া উচিত—তখন যৌথভাবে বা কোনোভাবেই কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি বাতিল না-করলেও, ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বর্জন না-করলেও একটি গোটা অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত বাধ্যতামূলক সমন্বয়ের (এর ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে পাকিস্তান-বিরোধীরা কমে গিয়ে অসহায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়) ব্যাপারে তার জিদ না ছাড়লেও লীগকে সরকারে যোগ দিতে দেওয়া হলো। ৯ ডিসেম্বর সংবিধান-রচনা পরিষদের যে-সভা শুরু হয়েছিল লীগ তাতেও হাজির হতে অস্বীকার করে, যার ফলে শুধুই একটি সাধারণ 'লক্ষ্যবস্তু'-বিষয়ক প্রস্তাব পাশ করানো ছাড়া ঐ সভা সেই মুহূর্তে আর কিছু করতে পারল না। নেহরুর করা এই খসড়ায় 'স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে'র আদর্শ বিধৃত ছিল। এর মৌলিক লক্ষ্য ছিল স্বশাসিত একক, সংখ্যালঘুর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, আর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গণতন্ত্র। অন্তত কংগ্রেসের চোখে লীগের বাদাধান-নীতির মধ্যে ছিল ঃ নেহরু-র 'চা-এর আসরের মন্ত্রিসভাগুলো'য় (বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার আগে বিভিন্ন নীতি সমন্বয়ের জন্য বেসরকারি অধিবেশন) যোগ দিতে গররাজি হওয়া, আর ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বাগাড়ম্বরে ভরা অর্থসংস্থান (বাজেট) উত্থাপন যাতে বড় ব্যবসাদারদের (এঁদের মুখ্য অংশই ছিলেন হিন্দু) ওপর অত্যধিক কর চাপানো হয়। ওয়াভেল এটিকে 'এক চতুর পদক্ষেপ' বলে মনে করেন, কারণ 'কংগ্রেস আর বিড়লার মতো তার ধনী ব্যবসায়ী সমর্থকদের মধ্যে (এটি) কীলক গুঁজে দেয়, আর কংগ্রেসও এই ব্যবস্থায় আপত্তি করতে পারে না' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, পৃ. ৪২৪)।

কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার ও পাঞ্জাবের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শগুলি উবে যাওয়ার উপক্রম হলো। নেহরু একই রকমে বিহার ও অন্যত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছিলেন। সুহ্‌রাবর্দির লাগাম-ছেড়ে-দেওয়া 'কলকাতার নিচের মহলের গুণ্ডাদের' দমন করার জন্য ওয়াভেল কলকাতায় অবিলম্বে সেনাবাহিনী তলব না-করায় আজাদ তাঁকে দোষী করেছিলেন (ওয়াভেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯ অগাস্ট ১৯৪৬, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৬১)। কিন্তু নেহরু যে বিহারের নিন্দা করেছিলেন, বৈরীভাবাপন্ন বিভিন্ন হিন্দু প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই তাঁর সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন প্যাটেল ঃ 'আমরা বিহারের জনগণ ও মন্ত্রিসভাকে লীগ নেতাদের হিংস্র ও ইতর আক্রমণের মুখে ছেড়ে দিলে মারাত্মক ভুল করব' (রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্যাটেল, ১১ নভেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭১)।

কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ সংযুক্তির সুস্পষ্ট অকার্যকারিতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মিলে ১৯৪৭-এর প্রথমদিকে অনেককেই ভাবতে বাধ্য করাল দেশ ভাগের কথা—এমন সব নিরিখে এ-যাবৎ যা মেনে নেওয়ার কথা ভাবাই যেত না। অচিরেই নেহরু প্যাটেলও তাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। বাধ্যতামূলক সমন্বয়ের ফলে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পরে পাকিস্তান গঠিত হতে পারে—এই ভয়ে বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি থেকেই সবচেয়ে একরোখা দাবি আসতে শুরু করল ঃ অস্ত্রোপচারের সমাধান। যেমন, হিন্দু মহাসভা

Scanned with CamScanner

পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র হিন্দু প্রদেশ গঠনের কার্যকর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে (ভি পি মেনন, পৃ. ৩৪৮)। ১০ মার্চ ১৯৪৭-এ নেহরু অপ্রকাশ্যে ওয়াভেলকে বলছিলেন, 'যদিও রূপায়িত করতে পারলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাই সবচেয়ে ভালো সমাধান ছিল—এছাড়া বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদই একমাত্র বাস্তব বিকল্প' (*ভাইসরয় জার্নাল*, পৃ. ৪২৬-২৭)। একমাস পরে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন ঃ 'একটা যুদ্ধের চেয়ে আমরা বরং ওদের পাকিস্তান ওদেরই ছেড়ে দেব, যদি উচিতভাবে বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদে আপনি রাজি হন' (এইচ ভি হডসন, *দি গ্রেট ডিভাইড*, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৬)।

Scanned with CamScanner